বিষয়বস্তুঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিমদের অবদানঃ

মুহার্‌রম মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৩ মুহার্‌রম ১৪৪৫ হিজরী, ১১ আগস্ট ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০৭

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ মুহর্‌রম মাসের ২৩ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আগামী মঙ্গলবার ১৫ ই আগষ্ট। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কবল থেকে আমাদের ভারত স্বাধীন হয়। সাধারণ ইতিহাসে আমরা মুসলিম সংগ্রামীদের নাম খুঁজে পায় না। অথচ এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান সবচেয়ে বেশি। যেসব বীর মুজাহিদগণের পরিশ্রম ও রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা ভারতের মাটিতে নিরাপদে বসবাস করছি।মাসজিদ মাদ্‌রাসা নির্মাণ করতে ও শরীয়তের উপর আমল করতে পারছি, তাঁদের অবদানকে স্মরণ করা ও তাঁদের জন্য দুআ করা আমাদের কর্তব্য।

তাই আজ আমরা সংক্ষেপে তাঁদের কিছু অবদানের আলোচনা করব ও তাঁদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করব।

প্রথমে আমাদের জানা দরকার, ভারতবর্ষ কীভাবে পরাধীন হয়েছিল। এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ ছিলএকটি উন্নত দেশ। ভারতের তৈরী কাপড় ও অন্যান্য জিনিস-পত্র খুবই বিখ্যাত ছিল। ভারতের পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন দেশে বহু মূল্যে ব্যাপক ভাবে বিক্রি হত। বিদেশিদের নিকট আপন দেশের পণ্যদ্রব্যের তুলনায় ভারতীয় দ্রব্য খুবই পছন্দ ছিল।বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় দ্রব্য ব্যাপক ব্যবহার হত। কাপড় ইত্যাদি বিভিন্ন রকম দ্রব্যের কাঁচা মাল ভারতের মাটিতে খুবই উৎপন্ন হত। তাই ভারতের ব্যবসিক ও শিল্প পতিরা বিদেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হতেন।

ইংরেজদের কাছে বিষয়টি ছিল লোভনীয়। তাই তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতে আসে।ভারত থেকে বেশির থেকে বেশি পুঁজি সংগ্রহ করে তা ইংল্যাণ্ডে পাঠান ছিল তাদের পরিকল্পনা। এই উদ্দেশ্যে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কিছু ব্যাবসায়ী একটি কোম্পানি স্থাপন করে এবং তাদের কিছু লোক ভারতে এসে ব্যবসা শুরু করে। কোম্পানির লোকছাড়াও ইংরেজদের পৃথক পৃথক দল ভারতের বিভিন্ন এলাকাই এসে ব্যবসা করতে লাগে। যারা কোম্পানির সাথে যুক্ত ছিল, তারা ইংল্যাণ্ড সরকারকে বাৎসরিক মোটা অংকের ট্যাক্স আদায় করতে থাকে।১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি ও অন্যান্য ইংরেজরা পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবসা করতে থাকে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড সরকার ঘোষণা করে যে, ইংরেজদের কোন দল বা ব্যাক্তি কোম্পানি ছাড়া আলাদা ব্যবসা করতে পারবে না। কোম্পানির নামকরণ ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’। সুতরাং সকল ব্যবসায়ী কোম্পানির অধীনে ব্যবসা করতে লাগে। এভাবে ব্যবসার মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও নবাবদের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিভিন্ন এলাকার নবাবেরা ইংরেজদের কাছ থেকে প্রয়োজনে টাকা পয়সা ধার নিতেন। ধারের বিনিময়ে তারা ইংরেজদের

কাছে জায়গা-জমি বন্ধকও রাখতেন। এভাবে তাদের আয়ত্বে অনেক জায়গা-জমিও চলে আসে।

আস্তে আস্তে ইংরেজদের মনে ভারতীয় সম্পদ লুট করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার বাসনা জাগে। আর এ জন্য তারা বিভিন্ন রকম ফন্দি ও চক্রান্ত শুরু করে দেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যারা কোলকাতা শহরে থাকত, তারা কোলকাতায় বসে চক্রান্ত করতে লাগে। তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা। ইংরেজরা তাঁকে পতন করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। আর এ ব্যাপারে ইংরেজরা যে বড় অস্ত্র হাতে পেয়েছিল তা হচ্ছে, বাংলার বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠ, কোলকাতার বড় ব্যবসায়ী উমিচাঁদ বা আমীর চাঁদ এবং রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি দেশের শত্রুরা সিরাজ ও দেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেন। ইংরেজরা এসব লোকদের নিয়ে জগৎশেঠের বাড়িতে গোপনে মিটিং করে। সেই আলোচনায় ইংরেজদের দূত মিঃ ওয়াটস্ সকলকে লোভ লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সিরজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে।আর যাতে সিরাজের সিংহাসনচ্যুত করার কারণে মুসলিমরা উত্তেজিত না হয়, তার জন্য সিরাজের আত্মীয় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল, মীরজাফরকে নামে মাত্র নবাবের পদে রেখে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা। মিঃ ওয়াটস্ সেই আলোচনায় আরও জানিয়েছিলেন, সিরাজের সাথে লড়তে গেলে যে প্রস্তুতি ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা বর্তমানে তাদের কাছে নেই। তখন জগৎশেঠ বলেছিলেনঃ টাকা যা দিয়েছি আরও যা দরকার আমি আপনাদের দিয়ে যাব, কোন চিন্তা নেই।

মিরজাফরকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করে বলেছিলেনঃ এটা সম্ভব নয়। কারণ, সিরাজ আমার আত্মীয়। তখন উমিচাঁদ তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেনঃ আমরা তো সিরাজুদ্দৌলাকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না। আমরা শুধু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বসাতে চাইছি। কারণ আপনাকে শুধুমাত্র

আমিই নই, ইংরেজরা এবং মুসলিমদের অনেকেই আর অমুসলিমদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। যাইহোক এভাবে মিরজাফরকে সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়।অবশেষে বহু চক্রান্ত করে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে নদিয়া জেলার পলাশীর আম বাগানে ইংরেজদের সাথে সিরাজুদ্দৌলার যুদ্ধ হয়। সিরাজের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারেরও বেশি। আর ইংরেজদের মাত্র ৩ হাজার। কিন্তু জগৎশেঠ, মিরজাফর ও নন্দকুমার প্রমুখ লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত হন। কয়েক শত সেনা শহীদ হন।ইংরেজরা সিরাজুদ্দৌলাকে বন্দী করে ও পরে শহীদ করে দেয়। সুতরাং সিরাজুদ্দৌলা ও তাঁর সেনারা হলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। সিরাজকে শহীদ করার পর ইংরেজরা বাংলায় শক্তিশালী হয়ে যায়। মীরজাফর কেবল নামে মাত্র নবাব থাকেন, আর আসল ক্ষমতা থাকে ইংরেজ তথা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী'র হাতে। 'নকশে হায়াত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৪৪ থেকে ২৪৬ পৃষ্ঠা ও 'চেপে রাখা ইতিহাসে'র ১৭৮,১৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে এসব কথা লেখা আছে।

এ ঘটনা দ্বারা জানে গেল যে, ভারতকে পরাধীন করতে কেবল মীরজাফরই দায়ী নন। বরং জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ ও নন্দকুমার প্রমুখ ব্যক্তিরাও দায়ী। কিন্তু এসব বিশ্বাসঘাকতদের কথা আমরা অনেকেই জানি না। তাই আমরা কেবল মীরজাফরকেই দোষ দিয়ে থাকি।

সুধীবৃন্দ ! পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও নানা রকম চক্রান্ত করে নিজেদের ঘাঁটি মজবুত করতে থাকে। সুতরাং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নবাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তারা ভারতের মাটিতে অনেক মজবুত হয়ে যায়। যার ফলে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ঘোষণা করে, পৃথিবী খোদার, দেশ বাদশার, আর হুকুম চলবে কোম্পানি বাহাদুরের। অর্থাৎ, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর হুকুম ও বিধি-বিধান মেনে চলার অধিকার ভারতীয় মুসলিমদের দেওয়া হবে না।

মনে রাখবেন, যুলুম অত্যাচার করে চিরদিন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায় না। সত্বরে হোক বা দেরিতে আল্লাহ তায়ালা যুলুমের অবসান করেন। সূরা বাকারার ২৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ"আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত।কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর প্রতি খুবই দয়ালু।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, দুনিয়াতে যখন কোন যালিম যুলুম অন্যায় করে সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তার মুকাবেলার জন্য আল্লাহ তায়ালা এক শ্রেণির মানুষকে খাঁড়া করে সেই যুলুমের অবসান করেন।

যাইহোক, কুখ্যাত ইংরেজদের ঘোষণাকে সেই সময় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন আমাদের মহামান্য বুযুর্গ শাহ আব্দুল আযীয (রহ)। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' হয়ে গেছে বেইমানদের হাতে চলে গেছে। সুতরাং, মুসলিমদেরকে দেশ আযাদ করার জন্য যুদ্ধ করা ফরয হয়ে গেছে। তিনি আরও জানিয়ে দেন যে, বর্তমান ভারতের যেসব আমীর উমরা ও নবাবগণ আছেন। তাদের মধ্যে যালিম ইংরেজদের মুকাবেলা করার আর ক্ষমতা নেই। অতএব, মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে। শাহ সাহেবের ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেহাদের ফতোয়া দেওয়ার পর উলামা ও সাধারণ মুসলিমগণ ব্যাপক ভাবে যুদ্ধ শুরু করেন।

শাহ আব্দুল আযীয (রহ) এর সুযোগ্য খলীফা হযরত সৈয়েদ আহমাদ রায় ব্রেলভী (রহ) শাহ সাহেবের আন্দোলনকে আরো মযবুত করে তোলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন এলাকাই ভ্রমণ করে মুজাহিদদের দল গঠন করেন। তিনি ভারতের হিন্দু মুসলিম সকলের কাছে এ বার্তা পৌঁছেদেন, রাজা-বাদশা হওয়া আমাদের লড়ায়ের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ভারত

থেকে অত্যাচারী বিদেশি শক্তিকে উৎখাত করা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম মিলে যাকে ইচ্ছা নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করবে।

সেই সময় পাঞ্জাব প্রদেশ ছিল শিখদের দখলে। রঞ্জিত সিংহ ছিলেন তাদের রাজা। ইংরেজরা শিখদেরকে নিজেদের দলে টেনে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে সৈয়দ আহমাদ (রহ) কে শিখদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। রাজা রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে জিহাদ করে 'বালাকোট' প্রান্তরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সৈয়দ আহমাদ সাহেবের শাহাদাতের পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর আন্দোলনকে চালিয়ে যান।এবং পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তা মহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে।

মনে রাখা দরকার, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ভারতবাসীর উপর ইংরেজদের অমানুষিক যুলুম-অত্যাচার প্রতিনিয়ত বাড়তেই থাকে। অসংখ্য আন্দোলন কারীদেরকে তারা ফাঁসি দিয়ছে, হত্যা করেছে, অনেককে আবার জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছে, তাছাড়া হাজার হাজার আন্দোলন কারীদের দীর্ঘদিন জেলে বন্দি রেখে অমানুষিক অত্যাচার করেছে ও তাদের জমি-জায়গা বাজেয়াপ্ত করেছ।

যাই হোক, ইংরেজদের সাথে বহু লড়াই হতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে পৃথক ভাবে লড়াই করে তেমন কোন লাভ না হওয়ায় বিপ্লবকারীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, গোটা ভারতে এক সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে হবে।তাহলে ইংরেজরা একই সময়ে সবার সাথে মুকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। তাই পরামর্শ করে ১৮৫৭ সালের ৩১ শে মে সারা ভারতে একসঙ্গে আন্দোলন করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখ আসার আগেই ইংরেজদের অত্যাচারের কারণে বিভিন্ন রাজ্যে পৃথক পৃথক ভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। যার ফলে ১৮৫৭ সালের আন্দোলনে বিপ্লবীরা পরাজিত হন। হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ) মাওলানা কাসিম, মাওলানা রশীদ আহমাদ, মাওলানা ফযলে হক রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ উলামাগণ ছিলেন

সাতান্ন সালের আন্দোলনের বীর মুজাহিদ। ১৯৫৭ সালের পর থেকে আরও ৯০ বছর ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়। যেসব বীর মুজাহিদ স্বাধীন ভারত দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা হিফযুর রহমান ও মাওলানা আবূল কালাম আযাদ রহিমাহুমুল্লাহ অন্যতম।

শ্রোতামণ্ডলী ! ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৯০ বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ১০০ বছর মুসলিমরাই আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৮৫৭ সাল থেকে অমুসলিমরাও আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। সময়ের হিসাবে মুসলিমদের আন্দোলনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ।কিন্তু ইতিহাসে তাঁদের নাম এত নগণ্য বলে প্রমান করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ১৭৫৭ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ মুসলিম ইতিহাস প্রায় চাপা পড়ে গেছে।

তবে এই দীর্ঘ সময়ে যেসব লক্ষ লক্ষ মুসলিম জেল খেটেছেন, শহীদ হয়েছেন।তাঁদের সকলের ইতিহাস সংরক্ষণ না থাকলেও, বিভিন্ন বেসরকারী ইতিহাস গ্রন্থে হাজার হাজার আলিম-উলামা ও সাধারণ বীর মুজাহিদের ইতিহাস আজও সংরক্ষিত আছে। এখানে আমরা দু'জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর আলোচনা করছি।

(১) মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদী (রহ)। তিনি ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার খয়রাবাদে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের একজন বিখ্যাত আলিম, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছিল তাঁর মহা অবদান। ভারতকে স্বাধীন করতে গিয়ে তিনি বন্দী হয়েছিলেন। বিচারের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে তাঁর সমস্ত সম্পদ বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেয় এবং তাঁকে আন্দামান জেলে পাঠান হয়। সেখানেই তাঁকে বাকি জীবনটা কাটাতে হয়েছিল।

মাওলানা ফযলে হক (রহ) কে জেলের এমন একটি ছোট কামরাতে রাখা হত, যা ছিল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তার ছাদ দিয়ে বৃষ্টি পড়ত। যার ফলে পায়খানা ঘরের মত ছোট কামরায় পানি জমে যেত। মাওলানাকে হাফ প্যান্ট আর ছোট জামা পরতে দেওয়া হয়েছিল। খাদ্য হিসেবে দেওয়া হত নানা জাতের মাছ সেদ্ধ। যা ছিল অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও খাবারের অযোগ্য। মাঝে মধ্যে বালি মেশানো রুটি খেতে দেওয়া হত। ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে তাঁকে গরম পানি পান করতে দেওয়া হত। পানি কিছুক্ষণ রাখলে ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিন্তু এমন করার উপায় ছিল না। কারণ, তাড়াতাড়ি পানি পান না করলে তা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করা হত। স্যাঁতসেঁতে ঘরে তাঁকে থাকতে হত। ঘরের মধ্যে রাত্রে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। অন্ধকারে তাঁকে একাই থাকতে হত। কাঁকড়া বিছেতে প্রায়ই দংশন করত। তার যন্ত্রণায় সর্বক্ষণ ছটফট করতে হত। সমস্ত শরীর দাদ, চুলকানি ও একজিমাতে ছেয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ঔষধ দেওয়া ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আরও দুঃখের কথা, ফযলে হক (রহ) কে দিনের বেলায় সাধারণ মেথরের মত নিজের ও অন্যান্য বন্দীদের পায়খানা পরিষ্কার করতে হত। মাওলানার মুক্তির জন্য তাঁর দুই পুত্র মাওলানা আব্দুল হক ও মাওলানা শামসুল হক জনসাধারণের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পিতার মুক্তির আবেদন করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেয়। যথা সময়ে তাঁর দুই পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফেরার আশায় আন্দমান পৌঁছান। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানতে পারেন, তাঁদের পিতা কয়েক ঘন্টা পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁরা দুই ভাই পিতাকে দাফন করে বুকভরা বেদনা নিয়ে খয়রাবাদে ফিরে আসেন। এ ঘটনাটি চেপে রাখা ইতিহাসের ২৪২,২৪৩ পৃষ্ঠায় আরও বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে।

(২) মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি (রহ) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বড় মাপের নেতা।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নাম আমরা অনেকেই জানি। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি (রহ) ছিলেন সুভাষ চন্দ্রের অন্যতম রাজনৈতিক গুরু। সুভাষের রাজনৈতিক জীবনের একটি ইতিহাস আছে। তা এই যে, সুভাষ বসু কিছুদিনের জন্য বোবা সেজে অসুস্থ হওয়ার ভান করে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে আবদ্ধ ছিলেন। দাড়ি-গোফ কাটেন নি। মাওলানা উবাইদুল্লাহ (রহ) এর ইঙ্গিতে তিনি তাঁর বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

তখন সুভাষের বাবা-মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। ওই বিজ্ঞাপনের লেখাটি এবং সুভাষ বসুর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর আত্মীয়স্বজনের সাথে এলগিন রোডের বাড়ীতে তোলা ছবিটি ‘মুক্তির সংগ্রামে ভারত’ নামক পুস্তকের ১৬৭ পৃষ্ঠায় আছে। সুভাষ বসু ওই অবস্থায় দাড়ি-গোফ নিয়ে মাওলানা উবাইদুল্লাহ (রহ) এর কাছে পৌঁছান। তিনি সুভাস বসুকে কাবুলিওয়ালার পোষাক পরিয়ে হাতের চামড়ায় ‘জিয়াউদিন’ নাম লিখে দিয়ে ওই নামেই তাঁকে ভারতের বাইরে পাঠিয়েছিলেন। আর সঙ্গে মাওলানার হাতের লেখা কয়কটি বিশেষ পত্র দিয়েছিলেন। যেগুলো তাঁকে অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা পেতে সাহায্য করেছিল। সুভাষকে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর মাওলানা সিন্ধি (রহ) ইংরেজদের কাছে ধরা পড়েন। তারা মাওলানাকে জেলে দেয়। জেলে তাঁকে অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অবশেষে তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়। এক বছর ন’দিন পরে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে যে, তিনি হৃদরোগে মারা গেছেন।

ভারত স্বাধীনের জন্য তিনি আফগানিস্থান, তুরস্ক, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের আরো বহু দেশে ছুটে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময় জওহরলাল নেহেরুর মাওলানার সাথে সাক্ষাতের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। মাওলানা তখন ইটালীতে ছিলেন। নেহেরুকে তাই সাক্ষাতের জন্য ইটালীই যেতে হয়েছিল। এ দ্বারা বোঝা যায় তিনি কত বড় মাপের নেতা ছিলেন।

কারাগারে মাওলানা দীর্ঘ ২৫ বছর কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এমন বীর মুজাহিদ সম্পর্কে সাধারণ ইতিহাসে কিছু উল্লেখ নেই। এ ঐতিহাসিক তথ্যটি ‘এ সত্য গোপন কেন’ পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। কোন কোন বন্দিকে লোহা গরম করে গায়ে দাগ দেওয়া হত আর বলা হত, তোমরা আন্দোলন বন্ধ কর আমারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেব।যাইহোক এসব ঘটনা দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি যে, বন্দিদের সাথে কেমন অমানুষিক ব্যবহার করা হত।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মুজাহিদগণকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চস্থান দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল